সেলিব্রিটি নিউজ, যৌনতার দাঁড়িপাল্লা আর মিডিয়া

উম্মে রায়হানা

সংবাদ নিয়ে কাজ করি অনেকদিন ধরে। লেখা, সম্পাদনা, পর্যবেক্ষণ, বিশ্লেষণ– এমন অনেক কাজই করেছি, করছি। বিভিন্ন সময়ে না চাইলেও তাই সংবাদ নিয়ে ভাবতে হয়। নারী প্রসঙ্গও কাজ করার আরেকটি জায়গা হওয়ায় সংবাদের জেন্ডার সেনসিটিভিটি এবং জেন্ডার কমপেনসেশনও বারবার চোখের সামনে আসে। এক একটা ঘটনা ঘটে, খবর হওয়ার মতন সে সব ঘটনায় নারী-পুরুষের সম্পর্কের সাথে অবধারিতভাবে আসে যৌনতার প্রসঙ্গ। সাধারণ নীতিনৈতিকতার সঙ্গে যুক্ত হয় যৌনতার দাঁড়িপাল্লা, জেন্ডার সেনসিটিভিটির সঙ্গে গুলিয়ে যায় জেন্ডার কমপেনসেশন।

গত কয়েক বছরে নারী-পুরুষ সম্পর্ক ঘটিত কিছু সংবাদ ও সংবাদ পরিবেশনের ধরন উল্লেখ করতে চাই। দুই হাজার একুশের সেপ্টেম্বর মাসে রাজধানীর এক অভিজাত এলাকায় মুনিয়া নামের এক মেয়ের মৃতদেহ পাওয়া যায়। প্রাথমিকভাবে ধরে নেওয়া হয় আত্মহত্যা। ঘটনার পর মেয়েটির ছবিসহ সংবাদ প্রকাশিত হয়। বেশিরভাগ সংবাদ মাধ্যমে শিরোনামে কলেজছাত্রী লেখা হলেও ভেতরে মেয়েটির নাম, গ্রামের বাড়ির ঠিকানা, কোনো কোনো ক্ষেত্রে বাবার নামও ছাপা হয়। কিন্তু প্রথম এক বা দেড় দিন পর্যন্ত হত্যাকারী বা আত্মহত্যায় প্ররোচনাকারী হিসেবে সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে একটি গ্রুপ অব কোম্পানির এমডি বা বিশিষ্ট শিল্পপতি বা এরকম নানা অভিধায় আড়াল করে মিডিয়া। কিন্তু শেষ রক্ষা হয় নি, মুনিয়ার বোন আত্মহত্যায় প্ররোচনার অভিযোগে মামলা করলে নির্যাতনকারীর নাম-পরিচয় সামনে আসে।

বসুন্ধরা গ্রুপের চেয়ারম্যান সায়েম সোবহান আনভীরের সাথে মুনিয়ার কথোপকথনের একটি অডিও টেপ পাওয়া যায়। ফাঁস হওয়া ফোনালাপ সাধারণত শুনি না। কাজের প্রয়োজনে কেসটা অবজার্ভ করতে হচ্ছিল বলে টেপটি শুনেছিলাম। শুনে মনে হয় নি ভদ্রলোক রেগে গিয়ে চিৎকার করে গালিগালাজ করে নরম মনের মেয়েটির মনে আঘাত দিয়ে বসেছেন। বরং বেশ বিজয়ী ভঙ্গিতে হেসে হেসে ঠান্ডা মাথায় নোংরা কথা বলে উস্কানি দিচ্ছিলেন তিনি।

মুনিয়ার ক্ষেত্রে 'রক্ষিতা' শব্দের প্রয়োগ বা অপপ্রয়োগ দেখা যায়। অসহায় এই মেয়েটি উপায়ান্তর না দেখে আত্মহত্যা করে থাকতে পারে বা তাকে ভাড়াটে খুনী দিয়ে হত্যা করানো হতে পারে। তার শরীরে গর্ভসঞ্চার হয়ে থাকতে পারে, না-ও পারে। প্রেম বা বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে অথবা শুধু অভাবের জীবন থেকে যৌন সম্পর্কের বিনিময়ে সাচ্ছল্যের লোভ দেখিয়ে ছোট শহর থেকে নিয়ে আসা একটি মেয়ের গল্প খুব নতুন কিছু নয়। এমনভাবে যৌনকর্মী হয়ে যায় রোজ কত শত

মেয়ে! সেই খবরই বা কে রাখে! এই বিশেষ কেইসে অভিযুক্ত ব্যক্তি হাই প্রোফাইল হওয়ায়, কনট্রোভারসি বেশি হলো– এইটুকুই।

আরেকটি ঘটনা ঘটল, কাছাকাছি রকমের। বিশিষ্ট সাংবাদিক শাকিল আহমেদের বিরুদ্ধে ভ্রূণহত্যা এবং (বিয়ের প্রতিশ্রুতিতে যৌন সম্পর্কে থাকা অর্থে) ধর্ষণের অভিযোগ তোলেন এক ভদ্রমহিলা। আমার যতদূর মনে পড়ছে, ব্যক্তিগত জীবনে চিকিৎসক এবং শখের নিউজ প্রেজেন্টার ওই নারীর নাম তৃণা। নামটা জানা গিয়েছিল কারণ ভুক্তভোগী নিজেই মিডিয়ার সামনে এসেছিলেন, সম্ভবত সংবাদ সম্মেলনও করেছিলেন। কিন্তু প্রথম আলো, ঢাকা ট্রিবিউন ইত্যাদি মানসম্পন্ন পত্রিকা ওই নারীর নাম সযত্নে গোপন রাখে।

এই ক্ষেত্রে একটা শ্রেণিবৈষম্য লক্ষ করার মতন। শাকিল আর আনভীর কাছাকাছি রকমের অভিযোগে অভিযুক্ত। অভিযোগ নিজে বিবাহিত হয়ে অন্য অবিবাহিত নারীর সঙ্গে যৌন সম্পর্ক, প্রতিশ্রুতিভঙ্গ, ভ্রূণহত্যা ইত্যাদি। মুনিয়া মরে যাওয়ায় আনভীরের বিরুদ্ধে অভিযোগ গুরুতর হয়ে যায়। অথচ এই দুই বিশিষ্ট পুরুষের একজনের পরিচয় গোপন রাখার চেষ্টা থাকলেও দ্বিতীয় জনের ক্ষেত্রে তা অনুপস্থিত। অবশ্য সংবাদমাধ্যম কর্মীদেরও হাত পা বাঁধা। মিডিয়া হাউজের মালিকেরা বেশিরভাগই শিল্পপতি। 'নাম বললে চাকরি থাকবে না' দশা কমবেশি সবার। সাংবাদিক সহকর্মীর ক্ষেত্রে সেই ভয় নেই। ফলে 'বিবাহের প্রলোভনে ধর্ষণ'-এর অভিযোগে অভিযুক্ত একাত্তর টেলিভিশনের হেড অব নিউজ শাকিল আহমেদের ছবি কম-বেশি সব পত্রিকাই প্রকাশ করে।

ধর্ষণের ভুক্তভোগীর বদলে ধর্ষণকারীর ছবি ছাপানোর একটা দাবি জোরেশোরে দেখা যায়। স্বাভাবিক হিসেবে সেটা অনৈতিক, অপরাধ প্রমাণের আগে কেউ অপরাধী নয়। কিন্তু অনেক সময় এমন পরিস্থিতি হয়, হয়ত হাতেনাতে ধরা পড়ে পুলিশে ন্যস্ত হয় কোনো ক্ষমতাহীন বৃদ্ধ, দরিদ্র পিডোফাইল বা প্রোস্টেট রোগী বা মাদ্রাসা শিক্ষক। দুই কাঁধে দুই ফেরেশতার মতন দুই পাশে দুই পুলিশ সদস্য নিয়ে 'ধর্ষকে'র ছবি ছাপা হয়ে যায়। কিন্তু তাতে তাদের মুখ ব্লার করে দেওয়া হয় না। আমি অন্তত দেখি নি তেমন ছবি।

শাকিল আহমেদের চেহারা ব্লার করার কোনো অর্থ অবশ্য ছিলও না। কেননা তিনি সাংবাদিকতার কারণেই এক পরিচিত মুখ। তারপরও এ কথা বলতেই হচ্ছে, বিবাহিত ও সন্তানের পিতা একজন পুরুষকে ধর্ষণের মতন অপরাধ প্রমাণ হওয়ার আগেই ছবি প্রকাশ করা তার সামাজিক জীবন, পারিবারিক জীবন ও কেরিয়ারের জন্য বিধ্বংসী। কিন্তু সে কথা কোনো সংবাদ মাধ্যম আমলে নিয়েছে বলে মনে হয় নি। অথচ নাম একবার প্রকাশ হয়ে যাওয়ার পরও নিহত মুনিয়ার সঙ্গে সায়েমের ছবি প্রকাশ করে সায়েমের মুখ ব্লার করে দেয় একটি নিউজ পোর্টাল। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে, এই ব্লার করা সাংবাদিকতার নীতি-নৈতিকতার কারণে যতটা, তার চেয়ে বেশি করা হয়েছে সায়েম সোবহান আনভীরের ক্ষমতার ভয়ে।

কিন্তু, দাম্পত্য কলহের জের ধরে স্ত্রী স্বামীর লিঙ্গ কেটে দিলে সেই স্বামীর ছবিতে মুখ ব্লার করে দেওয়া হয়েছে এমন নজির দেখেছি। সেই পুরুষ আনভীরের মতন ক্ষমতাবান নন বা শাকিলের মতন স্টার সাংবাদিক নন, উপরন্তু তিনি অপরাধীও নন, বরং সহিংসতার শিকার। তার এই সহিংসতার শিকার হওয়ার পেছনে নিশ্চয়ই তার স্ত্রীর প্রতি দীর্ঘ বঞ্চনার ইতিহাস রয়েছে। কিন্তু সে বিষয়ে কথা বলা ভিকটিম ব্লেমিং-এর শামিল হয়ে যাবে। ফলে, সে প্রসঙ্গ থাক। যৌনতার দাঁড়িপাল্লার কথা বলছিলাম। ভেবে দেখলাম, যৌনতার দাঁড়িপাল্লায় পুরুষের পৌরুষ এমনই ভারী যে, পরকীয়া করলে, প্রতারণা করে যৌন সম্পর্কে গেলে, নারী বা শিশু ধর্ষণ করলে তার জাত যায় না। কিন্তু লিঙ্গ বা অণ্ডকোষ কাটা গেলে মানসম্মান কিছুই বাকি থাকে না। যে খবরটির উদাহরণ দিলাম, সে ক্ষেত্রেও লোকটি ভিকটিম, তার সঙ্গে যৌন সহিংসতা ঘটেছে। তাকে সুরক্ষা দেওয়া রাষ্ট্র এবং সংবাদ মাধ্যম উভয়ের দায়িত্ব। কিন্তু এই দায়িত্ববোধ যেভাবে কাজ করছে, তাতে মনেই হয়, দাঁড়িপাল্লাটা সাধারণ নীতি-নৈতিকতার নয়।

সাংবাদিক শাকিলের ছবি ছাপা এবং তার বিরুদ্ধে অভিযোগকারীর নাম আড়াল করার বিষয়টিকে কীভাবে দেখা উচিত? নিশ্চয়ই ওই নারীর বিরুদ্ধে অপরাধ ঘটেছে। কিন্তু তিনি সেটা নিয়ে কুণ্ঠিত বা লজ্জিত নন, স্লাটশেমিং-এর পরোয়া তিনি করেন না, বোঝাই যাচ্ছে। তিনি নিজেই সংবাদ মাধ্যমের সামনে এসে বিবাহ-বহির্ভূত সম্পর্ক এবং ভ্রূণহত্যার ঘটনা জানিয়েছেন। ফলে তার নিরাপত্তার কথা ভেবে নাম গোপন করার প্রশ্ন তো এখানে নেই। তাহলে কেন এই গোপনীয়তা?

এই অভিযোগকারীর প্রসঙ্গে 'রক্ষিতা' অভিধা কাজ করে নি, শ্রেণিগত কারণেই করে নি। অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী, স্বাধীনচেতা নারী যৌনতার বিনিময়ে অর্থনৈতিকভাবে নির্ভরশীল হয়ে পড়েন নি বলে ধরেই নেওয়া হয় বা হয়েছে। ফলে 'রক্ষিতা'র মতন সামন্ততান্ত্রিক বিশেষণ এই কেসে অপ্রয়োজনীয় ছিল। কিন্তু তার নাম গোপন করার অর্থ কি এই নয় যে, মিডিয়া মনেই করে নারী মাত্রই দুর্বল, তাকে রক্ষা করতে হবে! তার নিরাপত্তা, যৌনতা বিষয়ক মানসম্মান বা যাকে বলা যায় ইজ্জত– রক্ষা করতে হবে গণমাধ্যমকেই। ফলে গড়ে হরিবোল অর্থাৎ মুখস্থবিদ্যা পদ্ধতিতে নারীর নাম পরিচয় আড়াল করেছে সচেতন সাংবাদিকরা।

ওই একই কারণে লিঙ্গ হারানো ওই ব্যক্তির চেহারা ব্লার করে দিয়েছে জাগোনিউজ২৪। পুরুষ হয়ে যৌন সহিংসতার শিকার হওয়া খুব ভয়াবহ। যে কারণে মেল রেপ ভিকটিমদের নিয়ে কথাবার্তা কম হয়। পুরুষেরা শিশু অবস্থায় যৌন নিপীড়নের শিকার হওয়ার বিষয়েও মুখ খোলে না। আধিপত্যশীল ধারণা এই যে, মাদ্রাসার ছেলে বাচ্চারাই কেবল ধর্ষণের শিকার হয়, যদিও বাস্তবতা তা হতে পারে না কোনোভাবেই।

নারীর তথাকথিত সতীত্ব বা পিওরিটি নিয়েও সংবাদ মাধ্যমের এই ডাবল স্ট্যান্ডার্ড লক্ষ করা যায়। বেশ কয়েক বছর আগে মডেল ও অভিনেত্রী হ্যাপি জাতীয় দলের ক্রিকেটার রুবেলের বিরুদ্ধে ওই একই ধারায় মামলা করলে সংবাদ মাধ্যম হ্যাপির সঙ্গে অত্যন্ত বৈরী আচরণ করে।

এমনকি হ্যাপির যৌন সম্পর্কের ইতিহাস প্রকাশ করতেও পিছপা হয় না। হ্যাপিকে 'বেশ্যা' বলে একবাক্যে দেগে দেওয়া হয়। সেই দাগাদাগিতে শামিল শুধু নয়, অগ্রগণ্য হিসেবে সামনে থাকে সংবাদকর্মীরাই। ফর্মে থাকা ক্রিকেটারের সঙ্গে প্রেমের হাইপ তুলে স্টান্টবাজির অভিযোগও আসে হ্যাপির বিরুদ্ধে।

ঘটনার কিছুদিন পর কোর্ট-কাচারির ঝামেলা মিটলে ক্রিকেটার রুবেলকে নিয়ে বিজ্ঞাপন নির্মাণ করে একটি বড়ো কোম্পানি। ওই বিজ্ঞাপনের সংলাপে ও বডি ল্যাঙ্গুয়েজে রুবেলের প্রবল পৌরুষ তুলে ধরা হয়। অত্যন্ত আগ্রাসী ওই বিজ্ঞাপনচিত্রটির বিরুদ্ধে মামলা করে দেওয়া উচিত বলে মনে করি। ওই ঘটনার পর ওই বিজ্ঞাপনচিত্র নির্মাণ ও প্রচার থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, পুরুষ তার পৌরুষের স্পর্ধা বজায় রাখবার দায়িত্ব একা বহন করে না, সেই দায়িত্বে নিয়োজিত থাকে সমাজ এবং গণমাধ্যমও। পুরুষের আগ্রাসী ও ধর্ষকামী আচরণকে 'জায়েজ' তো করা হয় বটেই, গ্ল্যামার ও স্ট্যাটাসের মানদণ্ড হিসেবেও বিবেচনা করা হয়। এই মানদণ্ডের ভিত্তি যৌনতা।

কেউ বলতে পারে বিজ্ঞাপন তো করপোরেটদের বিষয়, গণমাধ্যমকে এখানে দায়ী করা যায় কী করে? সত্য বটে, বিজ্ঞাপনের হিসাবনিকাশ আলাদা। কিন্তু সংবাদভিত্তিক বা বিনোদনভিত্তিক যেমনই হোক না কেন, টেলিভিশন চ্যানেলগুলোর মৌলিক মানদণ্ড থাকা প্রয়োজন। অশ্লীলতার অভিযোগে বিভিন্ন সময়ে নানা বিজ্ঞাপন নিষিদ্ধ হওয়ার কথা আমরা জানি। ইউটিউবে খুঁজলে ইতিহাসে নিষিদ্ধ হওয়া বিজ্ঞাপনের লম্বা লিস্ট পাওয়া যায়। ওপেন সোর্সের এই যুগে কিছুই লুকিয়ে রাখা যায় না। কিন্তু একটি মিডিয়া হাউজ কী প্রচার করবে আর কী করবে না তা থেকে বুঝতে পারা যায় কী মূল্যবোধ তারা লালন করে।

গণমাধ্যম পুরুষের অহংকারের উদযাপন যেমন করে তেমনভাবেই করে নারীর দুর্বলতা ও অসহায়ত্বের উদযাপনও। কয়েক বছর আগে দেশের একটি সংবাদপ্রধান টেলিভিশন চ্যানেল ঢাকাই চলচ্চিত্রের অভিনেত্রী অপু বিশ্বাসের সাক্ষাৎকার সরাসরি সম্প্রচার করে। সাক্ষাৎকারে অপু তার স্বামী শাকিব খানের বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলেন। অপুর অভিযোগ আসলে ঠিক কী, পুরো সাক্ষাৎকারটি দেখেও তা আমার বোধগম্য হয় নি। তবে এইটুকু বুঝতে পারি শাকিব অপুর সঙ্গে তার বিবাহের কথা গোপন রেখেছিলেন, এই সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে যা সামনে আসে। অনুষ্ঠানের মাঝামাঝি সময়ে বোমা বিস্ফোরণের মতন একটি আট দশ মাস বয়সী ফুটফুটে শিশুকে দর্শকের সামনে হাজির করা হয়।

শুনেছি প্রচুর টাকাপয়সার লেনদেন হয়েছে এই সাক্ষাৎকারের পেছনে। হওয়ার কথাই। সেটা এখানে খুব জরুরি প্রসঙ্গ নয়। লক্ষ করার মতন গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে মিডিয়ার ভূমিকা। অপু বিশ্বাসের অভিযোগের সলিড কোনো গ্রাউন্ড না থাকলেও টিভি চ্যানেল ও দর্শকের সাইকিতে অপুর কান্না জড়ানো অভিযোগ যথেষ্ট গ্রহণযোগ্য হয়েছে। মুনিয়ার মতো 'রক্ষিতা' বা হ্যাপির মতো 'বেশ্যা' গালাগালি শুনতে হয় নি অপুকে। কারণ তিনি বিবাহিত এবং শাকিবের সন্তানের মা। মা মানেই

দুর্বল এবং মহান। মাতৃত্ব অপু বিশ্বাসের ওপর মানুষের প্রবল বিশ্বাস এনে দিয়েছে, আর যা-ই হোন, অসতী তিনি নন। ফলে মিডিয়া ও দর্শকের প্রচুর সহানুভূতি পান অপু।

একটু আগে বললাম সংবাদকর্মী বা সাংবাদিকের হাত পা বাঁধা। মিডিয়া হাউজের মালিকানা পুঁজিপতিদের হাতে থাকে। ক্ষমতাবান এইসব মানুষদের সম্পর্কে সব সময় সব সত্য কথা বলাও যায় না। কিন্তু তারকারা অনেক সময় ধনী হলেও তাদের হাতে রাজনৈতিক বা অন্যায্য ক্ষমতা সব সময় থাকে না। কোনো কোনো সময় খ্যাতি, সম্পদ ও ক্ষমতা একত্রিত হলে বিনোদন সাংবাদিকদের কিনেও নিতে পারেন তারকারা। অনন্ত জলিল, আসিফ আকবর এরকম ক্ষমতাবান তারকাদের পক্ষে অত্যন্ত পুরুষাধিপত্যবাদী এবং হাইপ তোলা খবর প্রচারের ঘটনা ঘটেছে, ঘটছে।

আমাদের বিনোদন সাংবাদিকদের সাধারণ প্রবণতা হচ্ছে, স্টার বা সেলিব্রিটিদের সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখা। তা দোষেরও কিছু নয়। ক্রাইম বিটের সাংবাদিকদের পুলিশের সাথে, পুলিশের ইনফরমারদের সাথে যোগাযোগ থাকে; হেলথ বিটের সাংবাদিকদের পরিচিত থাকে ডাক্তার-নার্স থেকে শুরু করে হাসপাতাল ও মর্গের দারোয়ান-আয়ারাও। কিন্তু বিনোদন জগতের সংস্কৃতি একটু ভিন্ন। স্টারদের জীবনযাপন এবং চর্চাও সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষদের থেকে আলাদা। দেখা যায়, গ্ল্যামারাস জীবনের হাতছানিতে মোহগ্রস্ত বা লোভাতুর হয়ে নানারকম তারকাদের ব্যক্তিগত পিআর অফিসারের মতো কাজ করতে থাকেন বিনোদন সাংবাদিকরা। যার সঙ্গে সম্পর্ক ভালো, তার অন্যায় আড়াল করে যার সঙ্গে সম্পর্ক খারাপ তার বিরুদ্ধে গুজব ছড়ানো, ভুয়া সংবাদ প্রকাশ ইত্যাদি রোজকার চর্চা হয়ে গেছে কিছু কিছু বিনোদন সাংবাদিকের।

অপু বিশ্বাস প্রথম প্রথম লাইভে এসে কান্নাকাটি করলেও পরে অন্য অনেক টিভি চ্যানেলে এসে হেসে হেসেও ভিকটিমহুড প্লে করার সুযোগ পেয়েছেন ও নিয়েছেন। আমি নিশ্চিত অপু যদি নিজেকে অসহায়, পরিত্যক্ত ও প্রতারিত হিসেবে প্রচার না করে আইনি প্রক্রিয়ায় অধিকার আদায়ের চেষ্টা করতেন, তাহলে এত এত টকশোতে ডাক পেতেন না।

আরও একটি ঘটনার উল্লেখ করে আলোচনা শেষ করতে চাই। যদিও ঘটনাটি কোনো তারকার সঙ্গে নয়, ঘটেছে সাধারণ মানুষের সঙ্গেই। কয়েক বছর আগে নোয়াখালীর বেগমগঞ্জে এক নারী ধর্ষণের শিকার হন। ধর্ষণকারীরা তাকে ধর্ষণ করেই নিরস্ত হয় নি, তাকে বিবস্ত্র করে নির্যাতন করে এবং সেই নির্যাতনের ভিডিওচিত্র ধারণ করে ইন্টারনেটে ছড়িয়ে দেয়। এ বিষয়ক সমস্ত নিউজে 'বিবস্ত্র করে' কথাটি বারবার আসে। দীর্ঘ সময় পর হলেও মামলাটিতে আসামিরা গ্রেফতার হয়, এমনকি মামলার রায়ে তাদের শাস্তিও হয়। যদিও শাস্তি পর্যাপ্ত নয় বলে আমার ব্যক্তিগত মতামত। কিন্তু আরও হাজারো ধর্ষণ ও হত্যা মামলার যেখানে বিচারই হয় না, সেখানে আসামি গ্রেফতার ও শাস্তির রায় হওয়াই এক বিশাল বিজয়।

প্রধান আসামি দেলোয়ারের বিরুদ্ধে এর আগেও ধর্ষণের অভিযোগ রয়েছে। এখন প্রশ্ন হলো, যে আসামি এতটাই পরাক্রমশালী যে নিজের কুকীর্তির প্রমাণ রাখতে ও প্রচার করতেও পিছপা হয় নি, তাকে শাস্তির আওতায় আনা গেল কী করে? যেখানে এক একটি মামলা দশ পনেরো বছর ঝুলে থাকে, ধর্ষণের মামলা নানারকম সালিশ করে ডিসমিস করে দেওয়া হয়, সেখানে মাত্র দুই বছরের ব্যবধানে বিচার পাওয়া আশ্চর্য নয় কি?

আমার ধারণা, এখানে গণমাধ্যমের ভূমিকা রয়েছে। এতবার 'বিবস্ত্র করে' নির্যাতন লেখায় এই মামলাটি বিশেষ হয়ে উঠেছে। ধর্ষণ করে হত্যা, এমনকি হত্যা করে মৃতদেহের সাথে ধর্ষণের ঘটনার বিচার আমরা পাই না। এই ঘটনায়, আমার মনে হয়েছে, ধর্ষণের চেয়েও জরুরি হয়ে উঠেছে বিবস্ত্র করার বিষয়টি। পাবলিক সাইকিতে প্রবল নাড়া পড়েছে, যার প্রভাব পড়েছে প্রশাসনের ওপর, মামলার রায়েও এই প্রভাব থেকে থাকতে পারে।

একটি ভয়ঙ্কর মামলার বিচার পাওয়া, অপরাধীদের শাস্তির রায় হওয়া সন্তোষের বিষয় বটেই। কিন্তু এখানেও কাজ করেছে গণমাধ্যমের মগজে ও মননে থাকা যৌনতার দাঁড়িপাল্লা। এই দাঁড়িপাল্লায় ধর্ষণের চেয়েও বড়ো অপরাধ নারীকে বিবস্ত্র করে ভিডিওচিত্র ধারণ ও প্রচার। ভিজুয়ালি নারীর নগ্নতা প্রচার করে অসম্মান না করলে ধর্ষণের মতন নির্যাতন করেও আগেরবারের মতো, আরও অনেক অপরাধীর মতোই নির্ভয়ে ঘুরে বেড়াতে পারত দেলোয়ার– এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত।

জেন্ডার সেনসিটিভিটি এবং জেন্ডার কমপেনসেশন এক নয়। সাংবাদিকতার নীতি-নৈতিকতা এবং সমাজের প্রচলিত যৌন নীতি-নৈতিকতাও আলাদা। এই কারণে এখনো 'পরকীয়া' বা বিবাহ-বহির্ভূত যে কোনো সম্পর্ক ভাঙলে পুরুষকে 'ধর্ষক' বানিয়ে ফেলার মতন আইনের ধারা প্রচলিত থাকে। প্রতিহিংসাবশত এই ধরনের মামলা করে, নেমিং ও শেমিং করে কেরিয়ারে কিছুটা হলেও ক্ষতি করে ফেলা যায় প্রতারক প্রেমিকের। কিন্তু তাতে সত্যিকারের নির্যাতক ও নিপীড়কদের তেমন অসুবিধা হয় না। সমাজ চালিত হয় যৌন-নৈতিকতার মূল্যবোধ দিয়ে আর সংবাদমাধ্যম চালিত হয় একচক্ষু হরিণের মতন সমাজনির্মিত যৌনতার মাপকাঠি দিয়ে।

উম্মে রায়হানা সংবাদকর্মী, লেখক ও গবেষক। ummerayhana@gmail.com